পরাশক্তিঃ প্রাবল্য থেকে পতনের ইতিবৃত্ত!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক বিশ্বব্যবস্থার বাহ্যিক রূপ হল জাতিসংঘ। আর এর ভিতরের আসল রূপটি হল দুই পরাশক্তির অধীনে দুটি মেরু। এ দুই পরাশক্তি ছিল অর্থাৎ আমেরিকা-USA, সোভিয়েত রাশিয়া (USSR)।

আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার নিজ নিজ মিত্র রাষ্ট্রগুলোরে সমন্বয়ে গঠিত সামরিক জোট নিয়ে গড়ে উঠেছিল এই দুই মেরু। যেভাবে গ্রহকে কেন্দ্র করে উপগ্রহ আবর্তন করে তেমনি ভাবে এই দুই পরাশক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো বিভিন্ন ছোটে ছোটে ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রগুলো।

যেমন- ১৯৭১ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র ভেঙ্গে বাংলাদেশে গঠনের মধ্যে উপরে আলোচিত্র প্রক্রিয়ার বাস্তবতা বিদ্যমান। '৭১ এর সংঘাতে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ছিল আমেরিকার বলয়ে। অন্যদিকে ভারত ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার বলয়ে। মুজিবসহ আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকে ভারত সমর্থন দিয়েছিল। এবং এতে ছিল সোভিয়েতের প্রত্যক্ষ সমর্থন।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জানমালসম্মান বাঁচাতে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করেছিল। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি নির্ধারন করা হয়, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, এবং গণতন্ত্র।

যদিও এই দর্শনগুলোরে সাথে বাংলার আমজনতার কোন পরিচয় ছিল না, সমর্থনও ছিল না। তৎকালীন ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক এলিটরা এই সংবিধান বাংলার মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয়।

একইভাবে 'পরাশক্তির চিন্তা-চেতনা আর মূল্যবোধের সাথে নিজেদের চিন্তাচেতনাকে মিশিয়ে এক মিশ্রিত সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ' হিসেবে 'হাজার বছরে বাঙ্গালী চেতনা' নামে এক শিরকপ্রভাবিত এবং কট্টরভাবে ইসলামবিরোধী সংস্কৃতি তারা চাপিয়ে দেয়।

অর্থাৎ,

আনুগত্যের বিনিময়ে পরাশক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হওয়া গোলাম রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা পেত। তবে পরাশক্তির কাছ থেকে আসা এই সাহায্য ছিল সীমিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো যেত কিছু নির্দিষ্ট মানুষের পকেটে - যেমন ক্ষমতাসীন সরকারের প্রভাবশালী নেতা কিংবা শক্তিশালী সামরিক কমান্ডাররা এগুলো ভোগ করতো। কিছুদিন এই অবস্থা চললো।

তারপর কিছু কিছু সরকারের পতন ঘটলো। তাদের জায়গায় নতুন সরকার আসলো।

এ উত্থানপতনের ব্যাপারটা ঘটতো এভাবে- ঐ সরকার যে পরাশক্তির বলয়ে ছিল সেই পরাশক্তি তার সমর্থন সরিয়ে নিল। কিংবা পরাশক্তির ইচ্ছা থাকলেও উক্ত সরকারের পতন ঠেকাতে পারলো না। অথবা অপর পরাশক্তি সরকারবিরোধী কোন দলকে ক্ষমতাসীনদের মাঝে অনুপ্রবেশ করে বা অন্য কোন ভাবে (বিশ্বজগতের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে) সরকারের পতন ঘটিয়ে তার জায়গা দখল করতে সাহায্য করলো।”

যেসব শাসকগোষ্ঠী স্থিতিশীল হতে পারলো, তারা নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধকে সমাজের উপর চাপিয়ে দিল। ক্ষমতাসীন সরকার যে পরাশক্তির বলয়ে অবস্থান নিল, সেই পরাশক্তির চিন্তা-চেতনা আর মূল্যবোধের সাথে নিজেদের চিন্তাচেতনাকে মিশিয়ে এক মিশ্রিত সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সমাজের উপর চাপিয়ে দিল। এই সব মূল্যবোধ যতোই অযৌক্তিক কিংবা সুস্থ বিচারবুদ্ধির সাথে সাংঘর্ষিক হোক না কেন, ক্ষমতাসীনরা এগুলোকে উপস্থাপন করলো পবিত্র এবং মহিমান্বিত হিসাবে। এই সরকারগুলো তাদের শাসনাধীন সমাজের প্রচলিত ধর্মীয় আকীদাবিশ্বাসের বিরোধিতা করতে শুরু করলো। কালের পরিক্রমায় তারা রাষ্ট্রের সম্পদ লুটপাট করে নষ্ট করে দিল, ফলে মানুষের মাঝে অন্যায়-অবিচারদুর্বৃত্তি-অপরাধ বেড়ে গেল।

এই দুই পরাশক্তি বিশ্ব ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতো তাদের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার মাধ্যমে। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা বলতে আমরা কী বুঝাচ্ছি? এটা হল সেই প্রবল সামরিক শক্তি যা পরাশক্তির কেন্দ্র থেকে শুরু করে তার কাছে আত্মসমর্পণ করা দেশগুলোর ভূখন্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। আত্মসমর্পণ করা ভূখন্ডগুলো হল ঐসব ভূখন্ড, যারা কেন্দ্রের (অর্থাৎ পরাশক্তির) প্রতি অনুগত, কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত ও ফায়সালা মেনে নিতে বাধ্য এবং কেন্দ্রের স্বার্থরক্ষায় দায়বদ্ধ।

নিঃসন্দেহে, এই দুই পরাশক্তিকে (আমেরিকা এবং রাশিয়াকে) আল্লাহ তা'আলা যে ক্ষমতা দিয়েছেন, তা মানুষের বিচারবিবেচনা অনুযায়ী সুবিশাল। তবে বিশুদ্ধ মানবিক বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, এই পরাশক্তিগুলো যতোই শক্তিশালী হোক না কেন, কেবল নিজস্ব শক্তি দিয়ে, নিজ রাষ্ট্রে বসে (অর্থাৎ ক্ষমতার কেন্দ্রে বসে) দূরবর্তী কোন অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে তা টিকিয়ে রাখতে তারা সক্ষম ছিল না।

যেমন, মিশর কিংবা ইয়েমেনের শাসকগোষ্ঠী যদি স্বেচ্ছায় পরাশক্তিগুলোর কাছে আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে এই দেশগুলোর উপর নিজেদের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখা আমেরিকা কিংবা রাশিয়ার পক্ষে এককভাবে সম্ভব ছিল না।

এই পরাশক্তিগুলো বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। তাদের আন্তর্জাতিক শক্তির সাথে যুক্ত হয়েছে মুসলিম বিশ্বের ওপর চেপে বসা এবং পরাশক্তির প্রতিনিধি হয়ে কাজ করা শাসকগোষ্ঠীগুলোর আঞ্চলিক শক্তি। এসবই সত্য। কিন্তু তবু এই শক্তি পরাশক্তির বলয়ে থাকা একটি ভূখণ্ডকে পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রনের জন্য যথেষ্ট না। একারণে পরাশক্তিগুলো মিডিয়ার মাধ্যমে এক প্রতারণাপূর্ণ মায়াজাল তৈরি করে। মিডিয়া পরাশক্তিগুলোর ক্ষমতাকে উপস্থাপন করে অপ্রতিরোধ্য এবং সর্বব্যাপী হিসাবে।

এমন শক্তি যা কি না যমিন আর আসমানের সব কোণার উপর কর্তৃত্ব রাখে, যেন সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতার মতোই তাদের ক্ষমতা! মিডিয়ার মায়াজাল আমাদেরকে বুঝাতে চায় যে পরাশক্তিগুলো সর্বময়, অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী।

মিডিয়া আরো বুঝাতে চায় যে মানুষ ভয়ের কারণে না বরং স্বেচ্ছায় এসব পরাশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে। মানুষ তাদেরকে ভালোবাসে কারণ এই পরাশক্তিগুলো স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, সমতা, মানবতা এবং এজাতীয় আরো অনেক স্লোগান নিয়ে হাজির হয়।

মজার ব্যাপার হল, নিজদের মিডিয়ার সৃষ্ট এই মায়াজাল আর প্রপাগান্ডাকে পরাশক্তিরা নিজেরাও বিশ্বাস করে বসেছিল। তারা ভাবতে শুরু করেছিল সত্যিই বুঝি তারা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তারা বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে যে কোনো

স্থানকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম! কোন রাষ্ট্র যখন এই মিথ্যা কাল্পনিক শক্তিকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে, এবং সেই মোতাবেক আচরণ করতে থাকে, তখন তার পতনের পালা শুরু হয়। পরাশক্তিগুলোর ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটাই ঘটেছে। তারা তাদের মিডিয়ার প্রচারণাকে নিজেরাই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। নিজেদের বানানো মোয়াজালে নিজেরাই জড়িয়ে গেছে।

আমেরিকান লেখক পল কেনেডি ঠিক যেমনটি বলেছেন,

'আমেরিকা যদি তার সামরিক শক্তির ব্যবহারে অতি প্রসারতা আনে এবং কৌশলগতভাবে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ছড়িয়ে পড়ে তবে এটাই তার পতন ডেকে আনবে।

পরাশক্তিগুলোর বিপুল সামরিক শক্তির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে তাদের কেন্দ্রের, অর্থাৎ নিজ ভূখণ্ডের সামাজিক সংহতি (সমাজের বিভিন্ন অংশ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেকার সংহতি ও সমন্বয়।)

এই সংহতি ও সমন্বয় ছাড়া বিপুল পরিমাণ সামরিক শক্তি, গোলাবারুদ, সেনা আর প্রযুক্তির কোন মূল্য নেই। যদি সমাজের সংহতি ভেঙ্গে পড়ে, সামাজিক সত্ত্বা ধ্বসে যায় তাহলে এই বিপুল সামরিক শক্তিই পরাশক্তির জন্য পরিণত হতে পারে অভিশাপে।। যেসব উপাদান সামাজিক সংহতি এবং সামাজিক সত্ত্বার পতন ডেকে আনতে পারে সেগুলোকে 'সভ্যতা বিনাশী উপাদান বলা যায়। ধর্মীয় অবক্ষয়, নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক বৈষম্য, বিত্ত-বৈভব, আত্মকেন্দ্রিকতা, পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দকে প্রাধান্য দেয়া, সব কিছুর উপর দুনিয়াকে ভালোবাসা ইত্যাদি, 'সভ্যতা বিনাশী উপাদান।

যখন কোনো পরাশক্তির ভেতরে অনেকগুলো সভ্যতাবিনাশী উপাদান এক সাথে দেখা দেয়, এবং একে অপরের সাথে মিলে পরস্পরকে শক্তিশালী করে, তখন ওই পরাশক্তির পতনের গতিও বেড়ে যায়। এই উপাদানগুলো সমাজে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত থাকতে পারে, কিংবা সুপ্ত থাকতে পারে। তবে উপাদানগুলো পুরোপুরি ক্রিয়াশীল হয়ে পরাশক্তি এবং তার কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার পতন ঘটানোর পর্যায়ে পৌছাতে আরেকটি 'সাহায্যকারী উপাদান এর উপস্থিতি প্রয়োজন।

যখন সব উপাদানের উপস্থিতি থাকে, তখন পরাশক্তি ও তার কেন্দ্রীয় ক্ষমতার পতন ঘটে, সামরিকভাবে সে যতাই শক্তিশালী হাকে কেন। কেননা বিপুল পরিমাণ সামরিক ক্ষমতা ও মিডিয়ার মায়াজালের মাধ্যমে অর্জিত কেন্দ্রীভুত ক্ষমতা' শুধু তখনই কার্যকর হতে পারে যখন কেন্দ্র রাষ্ট্রে সামাজিক সংহতি ও একতা বজায় থাকে।

শক্তি বা ক্ষমতার দুটি ধরণ দুনিয়ার স্বাভাবিক নিয়মানুসারে, শাসনব্যবস্থা পুনরুদ্ধার হয় দুইভাবে।

· সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং মূল্যবাধে পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে,

অথবা

· (আকিদাহ কিংবা সত্যের ভিত্তিতে না হয়ে) কেবল জুলুম প্রতিহত

করে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে। কারণ যুলুম প্রতিরাধে এবং

ন্যায় প্রতিষ্ঠা মুমিন-কাফের সবার কাছেই সমাদৃত বিষয়। আবার যেসব শক্তি এ দু পদ্ধতির কোন একটির মাধ্যমে শাসনব্যবস্থাকে পুনরুদ্ধার করতে পারে, তাও দুই ধরণের।

এবং আল্লাহর ইচ্ছায় দুনিয়া ও শরিয়াহর মূলনীতি অনুযায়ী, পরাশক্তির সামাজিক সংহতি ও মিডিয়ার মায়াজাল ছিন্ন করে এবং ঈমান ও জিহাদের মূল্যবোধকে পুনরুজ্জীবিত করে, ঈমানদাররাই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা দুই অতিদানবের পতন ঘটিয়েছিলেন মাত্র ৩ যুগের ব্যাবধানে!

(২) পরাশক্তির পতনঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন

আশির দশকে ইসলামী উম্মাহর আফগানিস্তানে সংঘটিত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বর্তমান যুগের এক সুপারপাওয়ারের সাথে, যার নাম ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন।

দুনিয়ার পূর্ব দিকে সোভিয়েত রাশিয়া ও তার মিত্র শক্তি মিলে গঠিত হয়েছিল 'ওয়ারশ জোট' । পশ্চিমে ছিল আমেরিকা ও তার মিত্র শক্তি মিলে 'ন্যাটো জোট

’ । এই লড়াই গত শতাব্দীর শেষ দিকে ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে শুরু হওয়া বিশাল একটি যুদ্ধকে চূড়ান্ত সমাপ্তিতে পৌঁছে দিয়েছিল। (যা স্নায়ুযুদ্ধ নামে অভিহিত ছিল)।

আল্লাহর ইচ্ছায় এই যুদ্ধ ছিল স্পষ্ট বিজয় এবং বিরাট এক অলৌকিক ঘটনা। কারণ এর মাধ্যমে এযুগের বস্তুবাদী তাগুতি শক্তির সকল দম্ভ অহংকার খতম হয়েছিল। এটা সে সময়ে, যে সময়ে আধুনিক অস্ত্রে অকল্পনীয় উন্নতি সাধন করা হয়েছিল।

অন্যদিকে মুসলিমদের হাতে উল্লেখযোগ্য কোনো যুদ্ধাস্ত্র ছিল না, তাদের ভূমির শাসকরা দুনিয়ার ভোগবিলাসে মত্ত ছিল এবং আল্লাহ তাআলার শরীয়ত বাস্তবায়ন থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছিল। এর আবশ্যকীয় ফল ছিল তারা আল্লাহর পথে জিহাদ পরিত্যাগ করেছিল; বরং যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে ইচ্ছুক, তাদের প্রত্যেককে তারা কারাগারে আবদ্ধ করে রেখেছিল।

সেই সময়ে রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে মজুদ ছিল বর্তমান সময়ের অত্যাধুনিক হাজারো যুদ্ধযান ও উন্নত ট্যাংক বহর। আজ থেকে প্রায় ২০ বছরের কিছু পূর্বে তাদের কাছে শব্দের গতির চেয়ে তিনগুণ দ্রুত গতিসম্পন্ন অত্যাধুনিক হাজারো বিমান ছিল। আরও ছিল অস্ত্রে সজ্জিত লক্ষ লক্ষ সেনা।

এই বিশাল রাষ্ট্রটি আফগান প্রশাসনের সাথে মিলে সেই দেশে সমাজতন্ত্র প্রচারের চেষ্টা করে। অতঃপর আফগান প্রশাসনের বিরুদ্ধে তাদের অনুগত কমিউনিস্ট নেতা বারবাক কারমালের মাধ্যমে বিদ্রোহ ঘটিয়ে দখল করে নেয়। সর্বশেষ ১৯৭৯ সালের শেষ দিকে এই হিংস্র লাল বাহিনী কাবুলে প্রবেশ করে।

এই বিশাল ঘটনাটি তখন পুরো পৃথিবীকে প্রকম্পিত করেছিল। এই ভয়াবহ খবরটি আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছিল। আরবসহ পুরো বিশ্বে তাদের শ্বাস নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। এই ভয়ংকর ঘটনাটি মূলত পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহ ও ন্যাটো জোটের ক্ষমতার সমাপ্তি ঘোষণা করেছিল। রাশিয়া যখন ইউরোপের পূর্বের অংশ দখল করেছিল, তখন এই ন্যাটো জোট (এই জোটে আমেরিকা, ইউরোপসহ অন্যান্য অধিকাংশ দেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল) ইউরোপে যুদ্ধ প্রস্তুতি ও প্রতিরক্ষা অস্ত্রের পেছনে প্রায় সাড়ে চারশ মিলিয়ন ডলার খরচ করেছিল। এসবই করেছিল ইউরোপের উপর রাশিয়ার আক্রমণের ভয়ে। তারা (ন্যাটো জোট) কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সমস্ত শক্তিগুলোকে একত্রিত করেছিল, যেমনটা পূর্বে রোমানিয়াতে করেছিল।

ষাটের দশকে কোন রাষ্ট্র যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের আনুগত্য করতে অস্বীকার করত, তাদের শাসক ও কমান্ডাররা নিজেদেরকে রাশিয়ান ট্যাংকের নিচে আবিষ্কার করত। রাশিয়ানরা বিশাল বিমান বহর, সেনাবাহিনী ও অস্ত্র বহন করে নিয়ে আসত এবং পুরা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দিত। একারণে সমস্ত মানুষ এই কমিউনিস্টদের অনুগত দাসে পরিণত হয়েছিল।

এই লাল দানব হিংস্র রাশিয়ান ভাল্লুক হঠাৎ করেই ১৩৯৯ হিজরীতে তার বিমান ও ট্যাংক বহর নিয়ে কাবুল দখল করে বসে। তারা এসেছিল তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান ও তুর্কেমেনিস্তান দিয়ে। এর ফলে রাজধানীসহ সমস্ত জনগণ ক্রুসেডার রাশিয়ার দখলদারিত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

এপর্যায়ে এসে রাশিয়ার আফগানিস্তানে প্রবেশের পূর্বের অবস্থা একটু বিস্তারিত আলোচনা করা আবশ্যক।

কেন রাশিয়া আফগানিস্তানের প্রবেশ করেছিল?

আফগানিস্তান কি তাদের মৌলিক কোন স্বার্থ ছিল?

নাকি মৌলিক চাহিদার পাশাপাশি অন্য কোন স্বার্থ ছিল?

তখনকার সময়ে রক্তপিপাসু কিছু পক্ষ একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করছিল। তারা ছিল পূর্ব ও পশ্চিম, অর্থাৎ রাশিয়া ও আমেরিকা। মুসলিম বা অমুসলিম – সকল রাষ্ট্রের উপরই আক্রমণ করে রক্ত প্রবাহিত করার প্রতিযোগিতায় তারা নেমেছিল। এসময় রাশিয়া তাদের সাথে বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রকে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে সক্ষম হয়। এর মধ্যে আরবসহ অনেক ইসলামী রাষ্ট্র ছিল। যদি আপনি মানচিত্রের দিকে তাকান, তাহলে দুই ব্লকের মাঝে প্রতিযোগিতার স্বরূপটা বুঝতে পারবেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল বিশাল বিস্তৃত এক শক্তি। আজারবাইজান, চেচনিয়া ও তার আশপাশ, তুর্কেমিনিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরগিজিস্থান – এই সবগুলো রাষ্ট্রই সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বিশাল দানব রাষ্ট্রটি দুর্বল একটি রাষ্ট্রে প্রবেশের ফলে মানুষ অবাক হয়ে গিয়েছিল। যারা সংখ্যায়,

শক্তিতে ও যুদ্ধাস্ত্রে অনেক ছোট ছিল। ১৯৭৯ সালে আফগান প্রশাসনের সহায়তায় তারা এখানে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। এই ছোট রাষ্ট্রটির এবং রাশিয়ান লাল ভাল্লুক বিশাল দানবের মাঝে সকল বিষয়েই বিপুল পার্থক্য বিদ্যমান ছিল।

মানুষ কখনো কল্পনাও করেনি, এই দুর্বল রাষ্ট্রটি রাশিয়াকে পরাজিত করবে অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করার ফলে শুধু পরাজিতই করেনি; বরং তাদের নিশানা পর্যন্ত জমিনের বুক থেকে মুছে দিয়েছে। সকল প্রশংসা ও দয়া একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরাককে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। তারা ইরাকে প্রবেশ করে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় চেতনা ও সংবিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। ইরাকি বাথ পার্টি মুসলিম সন্তানদেরকে কমিউনিজমের দিকে আহ্বান করতে থাকে এবং তাদেরকে সমাজতন্ত্র ও নাস্তিকতা শিক্ষা দিতে থাকে। এর ফলে তারা বাথকে আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে নেয়।

সিরিয়াও সোভিয়েত জোটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এর ফলে তারাও সমাজতন্ত্রকে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়ের স্লোগান ছিল, 'ঐক্য মুক্তি সমাজতন্ত্র' । যা স্পষ্ট কুফর।

এমনিভাবে কমিউনিস্ট লাল সেনারা দক্ষিণ ইয়েমেনে প্রবেশ করে, এর ফলে ইয়েমেন সমাজতন্ত্র দিয়ে পরিচালিত হতে থাকে।

অতঃপর সোভিয়েত জোট আরো অগ্রসর হয়ে সোমালিয়া দখল করে নেয়। এর ফলে প্রেসিডেন্ট সিয়াদ বারি-এর সময়ে সোমালিয়া কমিউনিস্টপন্থী হয়ে যায়। যখন সে সমাজতন্ত্রের ধ্বংসাত্মক নীতি রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে, তখন তার সামনে কিছু আলেম বাঁধা হয়ে দাঁড়ালেন। যারা কিছু টাকা ও কয়েক লোকমা খাবারের জন্য দ্বীনের লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তাঁরা সমাজতন্ত্রেকে প্রত্যাখ্যান করলেন, যা সিয়াদ বারি মানুষের উপর বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করেছিল। ফলে সিয়াদ বারি সেই সমস্ত আলেমকে মোগাদিশু' র একটি মাঠে একত্রিত করে এবং তাঁদেরকে জনসমুখে আগুনে পুড়ে হত্যা করে। আল্লাহ তাআলা তাঁদের উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং দ্বীনের সাহায্যে জীবন দেওয়ার কারণে উম্মাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে উত্তম বদলা দান করুন।

পরবর্তীতে তারা মুসলিম ইরিত্রিয়াতে প্রবেশ করে এবং জনতা পার্টির নামে কমিউনিজমের ধারণা ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। এভাবেই কমিউনিষ্ট বাহিনী সোভিয়েত নাস্তিকতাকে বহন করে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। কোনো কিছুই তার সামনে বাঁধা হতে পারছিল না, কোনো শক্তিই তাকে থামাতে পারছিল না।

রাশিয়া ইউরোপের পূর্বাংশ দখলের পর ইউরোপ আমেরিকার একমাত্র চিন্তা ছিল – পূর্ব ইউরোপ প্রবেশ দ্বারে রাশিয়ান বাহিনীকে থামিয়ে দেওয়া। একসময় তারা জার্মানি পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যেমনটা আপনারা জানেন বিশ্বযুদ্ধে জার্মানিকে দুই অংশে ভাগ করা হয়েছিল, পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি। পূর্ব জার্মানি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে। এমনকি সোভিয়েত রাশিয়া ইউরোপের একেবারে গভীরে প্রবেশ করে ফেলে। নেদারল্যান্ড, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরি, ইউরোপের এ সকল দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমেরিকাসহ পশ্চিমা সকল নেতাই সোভিয়েত ইউনিয়নের ভয়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

এই অবস্থার মধ্যেই ইউরোপ-আমেরিকার জন্য একটি বিশাল ধাক্কা আসে। যেই ইথিওপিয়া কয়েক দশক ধরে খ্রিস্টান ধর্ম পালন করে আসছিল, তাও রাশিয়ার অধীনে পরিচালিত হওয়া শুরু করে। অবশ্য অল্প কিছু কাল মুসলিমরা সেটাকে ইসলামী হুকুমতের অধীনে ধরে রেখেছিল। ইথিওপিয়ার অধিকাংশ জনগণ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তারা খ্রিস্টানদের অধীনে রয়ে গিয়েছিল। তাদের সর্বশেষ নেতা ছিল সম্রাট হেইল সেলেসি। রাশিয়া সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে বিদ্রোহ ঘটাতে সক্ষম হয়, যারা ছিল ইথিওপিয়ার সেই সমস্ত সন্তান, যারা রাশিয়াতে পড়াশোনা করেছিল। সেখানে তাদেরকে সমাজতন্ত্র ও কুফরি শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

এরপর মেনজিস্তু হাইল ফিরে এসে ইথিওপিয়ার কর্তৃত্ব হাতে নেয়। এর ফলে আফ্রিকার এই বড় দেশটিও সোভিয়েতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এই বাহিনীর অগ্রযাত্রা মধ্য আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা পর্যন্ত চলতে থাকে। এমনকি রাশিয়া একসময়

কিউবা দখল করে, ফিদেল কাস্ত্রোর মাধ্যমে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করে। যে কিউবা আমেরিকার সমুদ্র তীর থেকে একশ মাইলেরও কম দূরত্বে ছিল।

দুর্বল জাতিগুলোকে দখল করার প্রতিযোগিতা চলছিল। তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করা হচ্ছিল ও নিরপরাধ জনগণকে হত্যা করা হচ্ছিল। যদিও তারা মুসলিম ছিল না বা ইসলামী রাষ্ট্র ছিল না।

অর্থাৎ যেকোনো শক্তি বা রাষ্ট্রের জনগণ এই বিশাল শক্তির দখলদারিত্বের বাইরে বসবাস করার ইচ্ছা করত, তাদেরকেই তারা হত্যা ও ধ্বংস করে দিত। তো, এই পরমাণু অস্ত্র আর প্রচলিত ও অপ্রচলিত অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় সোভিয়েত রাশিয়া যখন শব্দগতির চেয়ে অতিদ্রুত গতিসম্পন্ন বিমান তৈরি করে ফেলল, তখন আমেরিকাও তার মতো বিমান তৈরি করল। এ প্রতিযোগিতায় মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় হলো। সেই সময় সোভিয়েত জোটের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ ইচ্ছা করল, ইউরোপ-অ্যামেরিকাকে একটি কঠিন আঘাত করবে।

ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ পেট্রোলের মজুদ ছিল না। এর ফলে তাদেরকে আরব বিশ্বের পেট্রোল এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের পেট্রোলের উপর নির্ভর করতে হতো। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধের কৌশল ছিল, প্রথমেই আরববিশ্বকে দখল করে নেওয়া।

এটা এমন একটি স্বপ্ন, যা মস্কোর নেতারা অনেক পূর্ব থেকেই দেখে আসছিল। পেট্রোল আবিষ্কারের পূর্বে তাদের লক্ষ্য ছিল আরব উপদ্বীপের উষ্ণ পানির উপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কেননা রাশিয়ার উত্তর দিকের পানির উৎসগুলো দুই মাসের অধিক সময় ব্যবহার করা যেত না। যখন শীতকাল চলে আসত, তখন এই সমুদ্র বরফে পরিণত হয়ে যেত। তাই রাশিয়ার স্ট্র্যাটেজিক স্বার্থ ছিল আরবের উষ্ণ পানির উপর দখল প্রতিষ্ঠা করা।

পূর্ব-পশ্চিমের এ প্রতিযোগিতা ও পেট্রোল আবিষ্কারের পর, ব্রেজনেভ আরব ও তার তেল ক্ষেত্রগুলো দখলের মাধ্যমে ইউরোপ আমেরিকার উপর চূড়ান্ত আক্রমণের পরিকল্পনা করে। আর এই স্বার্থ থেকেই আফগানিস্তানের যুদ্ধ শুরু হয়। তাই আফগান ছিল অন্য বড় একটি স্বার্থ অর্জনের মাধ্যম।

কারণ আফগানিস্তান হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে থাকা ইসলামী রাষ্ট্র গুলোতে আসা-যাওয়ার পথ। তারা প্রথমে আফগানিস্তান দখল করবে এরপর আরব উপদ্বীপে প্রবেশ করবে, এভাবে পুরো আরববিশ্বকে দখল করে নেবে এবং সেই সমস্ত ছোট রাষ্ট্রের জনগণকে গুম, হত্যা করতে শুরু করবে। এটাই তাদের পরিকল্পনা ছিল। তারা কুয়েত থেকে শুরু করে ওমান পর্যন্ত এই কাজ চালিয়ে যাবে ভেবেছিল।

তখন আরববিশ্বে আমেরিকার হাতে শুধু আরব উপদ্বীপ ছাড়া অন্য কোনো রাষ্ট ছিল না। এমনকি মিশরের আব্দুল নাসের সোভিয়েত জোটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জামিআ আজহারের প্রধান মুফতি বলছিল, 'সমাজতন্ত্র ইসলামেরই অংশ' ।

এটা ছিল তার উপর আব্দুল নাসের এর চাপের ফল। এমনকি সুদানের শাসক জাফর পর্যন্ত সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করে নেয়। ফলে তখন পুরো আরববিশ্ব সোভিয়েত জোটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

ঠিক সেই সময় যখন আফগানিস্তানের যুদ্ধ শুরু হয়, তখন রাজনীতিবিদ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন লোকেরা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে, এই যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোল দখল করা।

কারণ আফগানের শুষ্ক মরুভূমি বা রুক্ষ পাহাড়ে তাদের আশার কিছুই নেই। আর এই কারণেই ১৯৮০ সালের ২০ জানুয়ারি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার এই বিষয়ে স্পষ্টভাবে কথা বলতে শুরু করে, যদিও তার মধ্যে ভয় কাজ করছিল। কারণ এ অঞ্চলে রাশিয়াকে প্রতিহত করার মতো তাদের কোনো সহযোগী ছিল না।

যদিও সেখানে পূর্ব থেকেই তাদের ঘাঁটি ছিল, কিন্তু সেগুলো ছিল অনেক ছোট। মার্কিনীরা উপসাগরের প্রভাবশালী নেতা ইরানের বাদশাহর উপর কিছুটা ভরসা করত, কিন্তু ইরানী বিপ্লব এসে তাদের সে ভরসাও শেষ করে দেয়। তখন তারা ইরানের বাদশাহ থেকেও হাত গুটিয়ে নেয়। এমনকি তারা তাকে রাজনৈতিক আশ্রয়টুকুও দেয়নি। এভাবে ইরানে তাদের সকল এজেন্ট থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ফলে শাস্তি জরিমানা যা হওয়ার সব আমেরিকার এজেন্টদের ভাগ্যে জোটে।

ইরানের বাদশার পরিণতি থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। বর্তমানে আরব উপদ্বীপে যারা নিরাপত্তার জন্য আমেরিকার উপর নির্ভর করছে, তারা মূলত উত্তপ্ত অগ্নিকুণ্ডে আশ্রয় নিয়েছে। যা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ এবং বুদ্ধিগত কোনও দিক থেকেই গ্রহণযোগ্য নয়।

আমাদের দ্বীন কোনো অবস্থাতেই এ কাজের বৈধতা দেয় না। বরং তারা মুসলিম দেশগুলো কাফেরদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে ইসলামের দুশমনদের সাথে আঁতাত করেছে। কাফেরদেরকে সাহায্য করছে, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

অন্যদিকে চিন্তাগত দৃষ্টিকোণ থেকেও এটা সঠিক নয়, কেননা ইহুদী-নাসারা হচ্ছে এই উম্মতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট শত্রু। তারা মুসলিমদের কোনো অঞ্চলে আসে একমাত্র ধন-সম্পদ লুণ্ঠন, মুসলিমদেরকে নির্যাতন এবং তাদের বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনাকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য। অতি শীঘ্রই আমেরিকা মুজাহিদদের আক্রমণের ফলে আরব উপদ্বীপ থেকে বের হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, যাতে তিনি সেই ভূমিতে আমাদের ভাইদেরকে বিজয় দান করেন।

বেলুচিস্তানের কোয়েটা থেকে ওমান পর্যন্ত যতগুলো শহর বা গ্রাম অতিক্রম করা হতো, অত্যন্ত আফসোসের সাথে প্রত্যেকটি স্থানে মস্কো থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত বেলুচ কমিউনিষ্ট পার্টির লাল পতাকা উড়তে দেখা যেত। তারা অধিকাংশ শহর ও গ্রাম দখল করে নিয়েছিল। এমনকি সেখানের প্রতিটি গোত্রের বৈঠকখানাগুলোতে কার্লমার্ক্স, লেলিন ও স্টালিনের ছবি দেখা যেত।

বেলুচ কমিউনিস্ট পার্টি প্রত্যেক বছর ২৭ ডিসেম্বর সারা দেশে জনসমাবেশ করত। এটা ছিল রাশিয়ান বাহিনী আফগানে প্রবেশের দিন। তারা সেদিন বিশাল আকারে অনুষ্ঠান করত, যাতে কমিউনিস্ট পার্টি এসে তাদেরকে সংবর্ধনা দেয়।

সুতরাং সেখানে কোনো প্রতিরোধ ছিল না; বরং রুশ বাহিনীকে প্রবেশের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছিল। আরব উপদ্বীপ দখল করা, তাদের নেতাদেরকে গুম করা ও তাদের সম্পদ লুণ্ঠনের মাঝে কোনো বাধাই তখন ছিল না।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা আফগানের মুসলিমদেরকে সাহায্য করেছেন, ফলে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে মানব ইতিহাসের শেষ যুগের সবচেয়ে বড় আক্রমণকে প্রতিরোধ

করতে সক্ষম হয়। যেই যুদ্ধ তাদের দেশ তছনছ করে দিয়েছে, সন্তানদেরকে এতিম করে দিয়েছে, নারীদেরকে বিধবা বানিয়েছে, ঘর-বাড়ি ও শহরগুলো ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা এই যুদ্ধে অগণিত মুজাহিদ প্রেরণ করেছে এবং বিশাল ত্যাগ স্বীকার করেছে।

সুতরাং এই ছিল আফগান-রাশিয়া যুদ্ধের পূর্ব পরিবেশ-পরিস্থিতি ও বাস্তবতা। তাদের চেষ্টা ছিল ইসলামী বিশ্বের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং ওহি নাযিলের ভূমি জাযিরাতুল আরবে পৌঁছে যাওয়া।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা উম্মাহর এই মহান ব্যক্তিদের মাধ্যমে রাশিয়াকে প্রতিহত করেছেন। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আশা রাখি, তিনি যেন তাদের নিহতদেরকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নেন, আহতদেরকে সুস্থ করে দেন, এতিম ও বিধবাদেরকে সাহায্য করেন, নিশ্চয় তিনি উত্তম অভিবাবক ও সর্বক্ষমতার অধিকারী।

আফগানিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি আত্মপ্রকাশ করে এবং মানুষকে স্পষ্ট কুফরের দিকে আহ্বান করতে শুরু করে। তখন তাদের সামনে কিছু আলেম ও যুবক বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তাদের সক্ষমতা ছিল অনেক স্বল্প।

এতটাই স্বল্প যে, তারা একটি বাসা ভাড়া নিয়েছিল তাদের কাজের অফিস হিসেবে, সেখানে তারা মিটিং সম্পন্ন করত। কিন্তু একমাসের বেশি সে ঘরের ভাড়া দিতে না পারায় তা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

এরপর আল্লাহ তাআলা কিছু মুজাহিদ নেতাকে সে সময় সাহায্য করলেন। তাঁরা কমিউনিস্ট পতাকা ছুড়ে মারলেন। তাঁদের প্রতি আমাদের ইনসাফ করা চাই, তাঁদের যথাযথ সম্মান করা চাই। কারণ তাঁদের কারো কারো বিরাট কুরবানী রয়েছে। পরে যদিও একসময় তাঁদের পদস্খলন ঘটেছিল।

অতঃপর যখন রাশিয়া আফগান থেকে বের হয়ে গেল, দুঃখজনকভাবে তারা ইখতিলাফ ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে গেল, যা ছিল আরও বেশি ক্ষতিকর। আমি আপনাদেরকে এই কথাটা বারবার বলেছি, এই দ্বীন কখনো ইখতিলাফ ও অনৈক্যের

সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কখনো হয়তো শত্রুকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবেন, কিন্তু ইখতিলাফের মধ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

এক সময় আল্লাহ তাআলা মুমিনদের উপর দয়া করলেন। ফলে তারা এমন একজনে ব্যক্তির অধীনে একত্রিত হয়ে গেল, যিনি আফগানিস্তানের ভেতরে বা বাইরে কোথাও তেমন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন না। কিন্তু একত্রিত হওয়ার বরকতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিজয় দান করলেন, তারা আফগানিস্তানে ৯৫% এর বেশি অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্যই।

সোভিয়েত জোটের প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল, সে পেট্রোল দখল করার মাধ্যমে ইউরোপ আমেরিকার টুঁটি চেপে ধরার যে উদ্ধত খাহেশ প্রকাশ করেছিল, তা বাস্তবায়নে ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে সরাসরি আক্রমণ করে বসল।

সাধারণ জনগণ যখন রাশিয়ান সেনা দেখতে পেল, তখন তাদের ভুল ভাঙল এবং এ বিশ্বাস হয়ে গেল যে, এটা ইসলামের উপর আঘাত, এটা কুফরী শক্তি। ফলে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এই আফগান জাতি লাল বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল।

আফগানবাসী আলেমদের ফতোয়ায় অনুপ্রাণিত হয়ে আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশায় কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই সময় আফগানের বড় বড় আলেমরা ফতোয়া দিয়েছেন, যাদের মধ্যে ছিলেন শাইখ ইউনুস খালিস রহ., শাইখ জালালউদ্দিন হাক্কানী। আল্লাহ তাঁদের হায়াতে বরকত দান করুক, তাঁদের সমস্ত আমল কবুল করুন।

এই ফতোয়ার পর আফগানিস্তানের পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র পবিত্র জিহাদের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। শুরু হয় সশস্ত্র জিহাদ। কবিলা ও গোত্রগুলো আনন্দিত হয়ে যায়, তাদের সন্তানদেরকে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে থাকে এবং তাদের মধ্যে শহীদদের ইতিহাস সংরক্ষণ করতে শুরু করে।

এই যুদ্ধটা এমন একটা সময়ে শুরু হয় যখন পুরো বিশ্ব রুশশক্তির সামনে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসকেও গোপন করার চেষ্টা করছিল।

এই দুরবস্থার মধ্যেই ১৯৮০ সালের ২০ শে জানুয়ারি জিমি কার্টার মিডিয়াতে এসে ঘোষণা দেয়, ‘নিশ্চয়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে আরব উপদ্বীপের দখল নিতে দেবে না।’

এ সমস্ত কাফেররা আমাদের সম্পদ নিয়ে, আমাদের রাষ্ট্র নিয়ে এবং আমাদের সমুদ্র নিয়ে প্রতিযোগিতা করছে। সে বলল, ‘আমরা তাদেরকে আরব উপদ্বীপে প্রবেশের অনুমতি দিব না এবং অতি শীঘ্রই আমেরিকা তাদের সামরিক শক্তি ব্যবহার করবে, যদি তা করতে বাধ্য হয়।’

অথচ বাস্তবে এই হুমকি ফাঁকা বুলি ছাড়া কিছুই ছিল না। কারণ সেই অঞ্চলে ইরানের শাহের পতনের পর তাদের উল্লেখযোগ্য কোনো শক্তির অস্তিত্বই ছিল না এবং সেই অঞ্চল পুরোটাই সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে পরিচালিত হচ্ছিল। তাই তার এই হুমকি ছিল একটি ফাঁকা বুলির মতোই।

যদি আফগানীদের জিহাদে আল্লাহ তাআলার সাহায্য না থাকত, তাহলে আরব উপদ্বীপ আল্লাহর শত্রুদের হাতে চলে যেত এবং তারা সেখানে সমাজতন্ত্রের সংবিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করত। তাদের অবস্থা সেই সময়ের দক্ষিণ ইয়েমেনের অবস্থার মতোই হয়ে যেত। কিন্তু সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদেরকে জিহাদের আদেশ দিয়েছেন এবং এই দ্বীনের উপর থেকে শত্রুকে প্রতিরোধ করার তাওফীক দিয়েছেন।

রাশিয়া আফগানিস্তানের প্রবেশের সাথে সাথেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিজেদেরকে একত্রিত করে ফেলে। কারণ আফগান পতনের পর অধিক সম্ভাবনা রয়েছে তাদের উপর হামলা হবার।

পাকিস্তান তখন একটা সাঁড়াশি জালে আটকা পড়ে যায়, কারণ রাশিয়া ও ভারতের মাঝে মৈত্রী চুক্তি ছিল, এর ফল হচ্ছে অবশ্যই পাকিস্তানকে দখল করে নেওয়া হবে।

তাই পাকিস্তানের নেতা ও কমান্ডাররা এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা থেকে বাঁচার পথ বের করতে বৈঠকে বসে। সেই বৈঠকে আলোচনা হচ্ছিল প্রস্তুতি নেওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে।

এছাড়া সোভিয়েত জোটের বিরুদ্ধে কী পরিমাণ শক্তি রয়েছে এবং তা জমা করার কেমন সময় তাদের হাতে রয়েছে তাও আলোচনায় ছিল।

তাদের তো ভারতের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ জয়ের সক্ষমতা নেই, এই অবস্থায় যদি রাশিয়া পেছন থেকে আক্রমণ করে, তাহলে অবস্থা কতটা ভয়াবহ হবে! তাদের মধ্যে একজন বলল, আফগানিস্তান এক সপ্তাহের বেশি সোভিয়েতের বিরুদ্ধে টিকতে পারবে না। তারা পরাজিত হবে, যেমনিভাবে রোমানিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্রের পতন হয়েছে।

তাদের মাঝে অধিক বিচক্ষণ ব্যক্তি বলল, তারা দুই মাসের মতো রাশিয়াকে প্রতিরোধ করতে পারার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়টা পুরো বিশ্ব কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা ছাড়া একদম নিশ্চুপ বসে ছিল। আরব দেশগুলো একটি শব্দ উচ্চারণ করেনি, যদিও তারা স্পষ্টভাবেই জানত এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য একমাত্র তারাই।

দুই মাস অতিবাহিত হওয়ার পর, তারা আফগানিস্তানের পরিস্থিতি বোঝার জন্য কিছু লোক প্রেরণ করে। তারা এসে দেখতে পেল আফগানীদের মানসিকতা অনেক অনেক উঁচু। তারা গরিব, তারা দুর্বল, তারা খালি পা, তাদের পেটে খাবার নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার উপর তাদের বিশ্বাস ও ভরসা প্রচণ্ড। আর তাদের কাছে ছিল সেই সমস্ত বন্দুক, যা দিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। সেগুলো ছিল অনেক পুরাতন বন্দুক। এমনকি অনেক আফগানী নিজের বকরিকে বিক্রি করে দিচ্ছিল এই পুরাতন অস্ত্রের বুলেট কেনার জন্য।

পরিদর্শকরা এই খবর সেই সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে পৌঁছাল। যখন পশ্চিমা দেশগুলো দেখল জিহাদের ধারাবাহিকতা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আফগানীদের পর্যাপ্ত হিম্মত রয়েছে, তখন ইউরোপ-আমেরিকা তাদের অনুগত শাসক ও সমস্ত মিত্রশক্তিকে আফগানীদের সাহায্যের আদেশ দিল এবং তারাও সোভিয়েত জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করল।

রাশিয়ার বিশাল শক্তির প্রতি প্রচণ্ড ভীতির কারণে আমেরিকা, ইউরোপ ও আরব কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। তারা দেখতে পাচ্ছিল না উম্মাহর মধ্যে পুনরায় জিহাদের

চেতনা জাগ্রত করার ফলে তাদের উপর কী ধরনের বিপদ আসতে পারে; বরং তখন তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল পুরো বিশ্বকে দখল করে নেওয়ার উপক্রম রাশিয়ান হিংস্র ভাল্লুককে যেকোনো মূল্যে আটকানো।

এই চরম ভয়-ভীতি ও রাশিয়াকে যেকোনো মূল্যে আটকানোর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই আমাদের সামনে সমস্ত দরজা খুলে যায়; বরং ভেঙে যায়।

অতঃপর যুদ্ধ তার ফলাফল প্রকাশ করল এবং সোভিয়েত জোট ভেঙে গেল। সেই সময় আমেরিকা ও তাদের কর্মকর্তারা উম্মাহর মধ্যে এই বরকতময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও জিহাদের প্রভাব দেখতে পায়।

সোভিয়েত জোটের শক্তির কি বিশাল ক্ষতি হয়েছিল তা দুনিয়ার জানা আছে। তারা পরবর্তীতে স্বীকার করেছিল, আফগান যুদ্ধে তাদের সর্বমোট ব্যয় হয়েছিল ৭০ মিলিয়ন ডলার।

এই যুদ্ধের পর সোভিয়েত জোটের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভ, যে ব্রেজনেভ ও তার পরবর্তী কয়েকটা নেতা শেষ হওয়ার পর ক্ষমতা পেয়েছিল, সে আফগান থেকে জরুরি ভিত্তিতে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিল।

তখন সোভিয়েত জোটের প্রচণ্ড ভয়ে সাধারণ-বিশেষ কেউই বিশ্বাস করত না যে, আফগানরা তাদেরকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে।

উম্মাহর মধ্যে রাশিয়ানদের ভয় উপর থেকে নিচ সবাইকে গ্রাস করে নিয়েছিল। আমরা আফগানে হিজরতের সময় শাইখরা আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সান্ত্বনা দিতেন। তারা বলতেন, রাশিয়াকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, ইত্যাদি আরো অনেক কথা।

কিন্তু যখন সোভিয়েত জোট চলে যাওয়ার খবর প্রচারিত হলো, তখনও মানুষেরা অন্ধবিশ্বাসের কারণে চিন্তাও করতে পারছিল না।

অনেক সৎ ব্যক্তিরাও বলেছিলেন, আফগান যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করার ক্ষেত্রে রাশিয়ার অনেক স্বার্থ রয়েছে। অন্যথায় তারা ২৪ ঘন্টার ভেতরেই যুদ্ধ শেষ করে ফেলতে পারে!

গর্ভাচেভ যখন বের হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, তখন সোভিয়েত জোটের প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের একটা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তারা বলে, 'যদি আমরা আফগান থেকে সরে আসি, তাহলে তা হবে বৈশ্বিক কমিউনিজম, সোভিয়েত জোট ও রাশিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য বিশাল একটি পরাজয় ও লাঞ্ছনা। তাই আমাদের এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসা আবশ্যক' ।

সে তাদেরকে বলল, 'বিষয়টা এর থেকেও বড়, এই মুহূর্তে সোভিয়েত জোটের ভান্ডারে তোমাদের সন্তানদের জন্য দুধ ক্রয়ের টাকাও অবশিষ্ট নেই।' আফগান যুদ্ধ সোভিয়েত জোটকে আস্তে আস্তে নিঃশেষ করে ফেলেছিল। সেই সাথে আল্লাহর ইচ্ছায় সোভিয়েতের অভ্যন্তরেও অনেকগুলো কারণ তৈরি হয়, যা তাদেরকে ভেঙে ফেলে। আর এই মহান যুদ্ধটা ছিল তৃতীয় আঘাত, আল্লাহর ইচ্ছায় যা তাদের মেরুদন্ডকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে।

তারা ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে প্রবেশ করে ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে বের হয়ে যায়। প্রায় দশ বছর তারা আফগান দখলে রেখেছিল। তারা ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে আফগানে প্রবেশ করে, আল্লাহর ইচ্ছায় দশ বছর পর ১৯৮৯ সালের সেই সপ্তাহে অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর এক সাথে পুরা বিশ্ব থেকে সোভিয়েতের সমস্ত দূতাবাসের পতাকা নামিয়ে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলা হয়।

সোভিয়েত জোটের প্রভাব বিলুপ্তির পর সে স্থানে রাশিয়ার পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে টুকরা-টুকরা হয়ে যায়, তাদের জোট থেকে ১৫টি রাষ্ট্র বের হয়ে যায়।

আর এভাবেই বিশ্ব থেকে কমিউনিজম নামক শয়তানী আদর্শের বিলুপ্তি ঘটে।

(মুহসিনে উম্মাহ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ (রহ)'র আলোচনার ট্রান্সক্রিপ্ট থেকে অনূদিত, সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত)

----

(৩) সাম্রাজ্যের সমাপ্তিঃ আমেরিকা!

ইরাক আক্রমণের প্রাক্কালে তৎকালীন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ, ওয়াশিংটন কেন্দ্রিক সমমনাদের সমন্বয়ে সংগঠিত থিঙ্কট্যাঙ্কের মাধ্যমে সূত্রপাত হয়েছিল "নতুন মার্কিন শতাব্দী প্রকল্প" (**Project for the New American Century-PNAC**) এর।

এই প্রকল্পনুযায়ী "আফগানিস্থান পরাভুতকারী "ক্ষমতার মোহে অন্ধ মার্কিনীরা প্রস্তাব করে- একুশ শতকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এক সাম্রাজ্য সৃষ্টির কথা বলা হয়। ঐ সাম্রাজ্যে ভেটো ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র যুক্তরাষ্ট।

অর্থাৎ, শুধু যুক্তরাষ্টই হবে জাতিসংঘের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অধিকারী। অর্থাৎ, কোনো উন্নত শিল্পায়িত জাতিরও আঞ্চলিক অথবা বৈশ্বিক পর্যায়ে ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ থাকবে না।

এই **PNAC**'র কর্তাব্যক্তিদের অন্যতম জর্জ বুশ আমলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড, রিচার্ড পার্ল, পল উলফোউইজ, জর্জ বুশের ভাই জেব বুশ প্রমুখ।

২০০৩ এর ২১ মার্চে (ইরাক আক্রমণের পর দিন) রিচার্ড পার্ল আমেরিকার **Enterprise Institude** এ এক ব্রিফিং সেশনে বলে,

"ইরাক দখলের পর যুদ্ধোত্তর সল্পকালীন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, জাতিসংঘের বৈপ্লবিক সংস্কার (যেমন, নিরাপত্তা পরিষদের বাকি রাষ্টের ভেটো ক্ষমতা কেড়ে নেয়া বা অপসারণ), ইরান ও সিরিয়ার শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন (**regime Change**) এবং ফ্রান্স ও জার্মানির প্রতিবাদী জালগুলি ছেটে ফেলা।"

নিঃসন্দেহেই এ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কোনো বৈধতা অথবা নীতিনৈতিকতার কোনো জটিলতাকে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকরা মোটেই আমলে আনার কথা চিন্তাও করেনি। **PNAC** তে তার কোনো নমুনাই উপস্থিত ছিল না। বরাবরের মতো মেকিয়াভেলিই হয়েছিল তাদের প্রধান গুরু।

আফগানিস্তান দখল করার পর মার্কিন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক **Terror Risk Country** হিসেবে সন্দেহজনক যে ২৪টি রাষ্ট্রের তালিকা তৈরী হয়, তন্মধ্যে উত্তর কোরিয়া ব্যতীত বাকী ২৩টিই ছিল মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র।

বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন আর প্রথাগত রাজনীতির মাধ্যমে বৈশ্বিক সংকট নিরসনের অলীক স্বপ্নদ্রষ্টাদের ব্যর্থতা নিঃসন্দেহেই প্রমানিত হয়েছে, যখন বিলিয়নসংখ্যক সদস্য বিশিষ্ট উম্মাহর সামনে আমেরিকা হাসতে হাসতে একের পর এক মুসলিম দেশে আগ্রাসন চালিয়েছে এবং তদ্রুপ আচরনের পুনরাবৃত্তির ঘোষনা দিয়েছে প্রকাশ্য দিবালোকে।

যদি ইরাক ও আফগানিস্তানে আমেরিকা প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন না হতো, (যার ফলাফল ছিল আমেরিকার অর্থনীতির মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়া এবং বিশ্বের সম্মুখে লাঞ্ছিত হওয়া) তবে গোটা বিশ্ব, বিশেষত মুসলিমবিশ্বের চিত্র কী হতো তা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু আল্লাহ তা আলা চাইলেন আরব মুজাহিদদের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর উপর ইহসান করতে। আমেরিকার সিংহাসন চুর্ণবিচুর্ণ হলো আল্লাহ তা আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যাক্তিদের উসিলায়।

৯/১১ পরবর্তী সময়ে ইরাক, আফগানিস্তান, সোমালিয়াসহ অন্যান্য মুসলিম ভুমিতে (মোট ৮০টি দেশে এই হীন কর্মসূচী চলমান ছিল) আমেরিকানদের তথাকথিত "ওয়ার অন টেরর" এ মুসলিম প্রতিরোধবাহিনীর মোকাবেলা করতে গিয়ে -

নিহত হয় ৯ লাখ সৈন্য।

খরচ হয় ৮ ট্রিলিয়ন ডলার।

নিজ দেশে নস্ট হয় রাজনৈতিক সংহতি।

যার ফলে, ২০২১ এর আগস্টে আফগানিস্তান ত্যাগে বাধ্য হয় আমেরিকা। ফিরে আসে ইসলামী রাস্ট্র। অন্যান্য মুসলিম ভুমিগুলোতে আমেরিকান প্রভাব হয় অনেকটাই বিলুপ্ত। আটলান্টিকের ওপারে আবারো মুনরো ডক্ট্রিনের আলোকে নিজ দেশের কারবার নিয়েই সীমাবদ্ধ থাকার জোর আওয়াজ ওঠে আবারো!

এমনকি ইউরোপেও আমেরিকান আধিপত্য ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়, রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের মাধ্যমে। আরব বসন্ত, উত্তর কোরিয়া ও চীনের আস্ফালনের কারণে এশিয়াতেও ক্ষয়িষ্ণুতার মুখে পরে ২য় বিশ্বযুদ্ধ বিজয়ী 'পরাক্রমশালী' আমেরিকা। গোটা দুনিয়াতেই আমেরিকার উঁচু নাক আজ মাটিতে ঘসা খাচ্ছে!

আর এই পতনের শুরু ও শেষ রচিত হয় মহান মুজাহিদদের হাতে! ফা লিল্লাহিল হামদ।

দাওয়াতী, রাজনৈতিক ও চিন্তার ময়দানে স্থবিরতায় আক্রান্ত এসকল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দ্বারা বাস্তব কোনো পরিবর্তন আনা যে সম্ভব নয়, তা উম্মাহ দেড় যুগ আগেই প্রমাণ পেয়েছে।

এবিষয়টি কেবল ঐসকল ব্যক্তির বোধগম্য নয়, যার আকল ছিনতাই হয়ে গিয়েছে অথবা ব্যক্তিস্বার্থ বা দুনিয়াপূজার বাইরে যাদের কোনো চিন্তাই নেই।

কুরআন সুন্নাহর আলোকে ঈমান ও কুফরের মধ্যকার সংঘাতের সূত্র আত্মস্থকারী কোনো মুসলিমের কাছেই আমেরিকার আগ্রাসী মনোভাবের বাস্তবতা উপলব্ধি করা কঠিন কোনো বিষয় নয়।

বরং আরও অগ্রসর হয়ে একথাও নির্দ্বিধায় বলা সম্ভব, ন্যুনতম বোধশক্তি রয়েছে এমন কোনো ব্যক্তির জন্যও আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি নির্মম বাস্তবতা অনুধাবন করা কষ্টকর নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমাদ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ও নীতিনির্ধারকদের মানসিকতা এডলফ হিটলারের মতো উল্লেখ করে উদ্ধৃত করেছেন **Mein Kampf** বইয়ের (যা **Adolf Hitler** এর আত্মজীবনী) ৫৩তম পৃষ্ঠা থেকে নিম্নোক্ত বাক্যটি-

"ত্রাস ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই কেবল যুক্তির উপর বিজয়ী হওয়া যায়।"

(The one means that wins the easiest victory over reason- Terror and force!)

কতই না দুঃখজনক, একজন সেকুল্যার যা বুঝতে পেরেছেন, উম্মাহর বহু আন্তরিক সদস্য তা বুঝতে অক্ষম।

উম্মাহকে অবশ্যই বুঝতে হবে, মুসলিমদের উপর আমেরিকা ইসরায়েল বা ভারতের আগ্রাসন কখনই সভা-সমিতি প্রথাগত রাজনীতি বা পত্রিকায় মাধুর্য্যমন্ডিত কলাম লেখার মাধ্যমে বন্ধ হবে না।

জনপ্রিয়তা, ভাষার সৌন্দর্য, কল্পনাপ্রসুত "বাস্তবতার দাবী" কিংবা অসম্ভব প্রতিশ্রুতি দ্বারা প্রতারিত হওয়া থেকে বেঁচে থাকা উম্মাহর জন্য অপরিহার্য। হতে পারে আপনার অনুসরনীয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠী "ইলম বা দাওয়াতের" পথের মহীরুহ কিংবা মঞ্চকাপানো বক্তা।

বাস্তবতা হচ্ছে আমেরিকা, ইসরায়েল বা ভারতের মতো বিশ্ব অপরাধীরা বিবেক বা যুক্তির ভাষা গ্রহন করবে বা তাদের মদদপুষ্ট মুরতাদ শাসকগোষ্ঠী যুক্তির ভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হবে, এমন কল্পনা কেবল ইতিহাসবিস্মৃত, রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবঞ্চিত, মোহগ্রস্থ অথবা আত্মপ্রবঞ্চিত ব্যক্তিবর্গের দ্বারাই সম্ভব।

এবং আমেরিকা ইসরায়েল বা ভারতের মতো চিহ্নিত অপরাধী মোড়লদের সম্ভাব্য সকল উপায়ে সর্বত্র প্রতিরোধ, অবরোধ ও আক্রান্ত করার মাধ্যমেই ইসলাম ও মুসলিমদের নিরাপত্তা ও সম্মান ফিরিয়ে আনা সম্ভব।